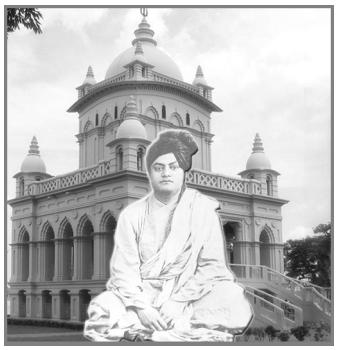

নতুন যুগের নতুন আচার্য

স্বামী ঋতানন্দ

যুগে যুগে অধর্মের গ্লানি দূর করে মানুষের উদ্ধারের জন্য ঈশ্বর অবতাররূপে অবতীর্ণ হন। তাঁর অবতরণ আমাদের উত্তরণের জন্য। শ্রীরামকৃষ্ণ এযুগের অবতার। শ্রীশ্রীমা সারদা দেবী তাঁর লীলাসঙ্গিনী। আর এই নতুন যুগের আচার্য—যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। সনাতন ভারতবর্ষ তাঁদেরকেই 'আচার্য' নামে অভিহিত করে থাকে, যাঁরা শ্রুতিপ্রস্থান (উপনিষদ), স্মৃতিপ্রস্থান (গীতা) ও ন্যায়প্রস্থান (ব্রহ্মসূত্র)-এর তাৎপর্য, ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করে ভাষ্যরচনা করে থাকেন। যেমন—শংকরাচার্য, রামানুজাচার্য, মধ্বাচার্য, নিম্বার্কাচার্য।

স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য অনুসারে প্রস্থানত্রয়ের ভাষ্য রচনা না করেও যুগাচার্য। কারণ, তিনি সমন্বয়াবতার শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-বাণীর যুগোপযোগী ব্যাখ্যাকার ও ভাষ্যকার। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন হল বেদস্বরূপ। তিনি সর্বজ্ঞানের জীবন্ত আধার। রোমাঁ রোলাঁ বলেছেন : ভারতবর্ষের পাঁচ হাজার বছরের পঞ্চাশ কোটি মানুষের যে-অধ্যাত্মসাধনা, ধর্মসাধনা, তার ফলস্বরূপ শ্রীরামকৃষ্ণজীবন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর জীবনে সর্বধর্ম সমন্বয় করে দেখিয়েছেন, 'যত মত তত পথ'। তাই তিনি সমন্বয়ের অবতার। অক্ষরময় শাস্ত্রের তাৎপর্যের ব্যাখ্যাকার নন, সর্বশাস্ত্র সমন্বয়কারী শ্রীরামকৃষ্ণজীবন-বেদের ভাষ্যকার স্বামী বিবেকানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণ সম্পর্কে স্বামীজী বলেছেন : "He lived that great life, I read the meaning." অর্থাৎ তিনি সেই মহান জীবনটি যাপন করে গেছেন এবং আমি সেই জীবনের তাৎপর্য অনুধাবন করেছি। এই তাৎপর্য অনুসন্ধানের ও তা প্রকাশের কারণ কী? কারণ হল—বর্তমান কালের ও অনাগত ভবিষ্য- প্রজন্মের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, তাদের নানা জীবনজিজ্ঞাসা, জীবন-সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে শ্রীরামকৃষ্ণ-যাপিত জীবন অনুধ্যানে।

'ঠাকুরের হাতের যন্ত্র' নরেনকে 'আচার্য' হওয়ার চাপরাশটি কাশীপুরে অন্ত্যলীলাকালে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বয়ং দিয়ে গিয়েছিলেন। একটা কাগজে তিনি নিজ হাতে লিখেছিলেন : ''নরেন শিক্ষে দিবে, যখন ঘুরে বাইরে হাঁক দিবে।" এ এক অদ্ভুত উদাহরণ। জীবন্ত-শাস্ত্র স্বয়ং তাঁর তাৎপর্য, স্বকীয়তা উদ্‌ঘাটনের ভারটি দিয়ে গেলেন সপ্তর্ষির শ্রেষ্ঠ ঋষিকে, জগৎকল্যাণের জন্য।

শাস্ত্রের অন্তর্নিহিত সুগভীর অর্থ উপলব্ধি করতে গেলে প্রথমে তার ভাষ্যকে বুঝতে হয়—এটিই শাস্ত্রপাঠের ও তার তাৎপর্য গ্রহণের প্রচলিত নিয়ম। নতুন যুগের আচার্য স্বামীজী নিজমুখে হরি মহারাজকে দিয়ে গেলেন আধুনিক শ্রীরামকৃষ্ণজীবন-বেদ উপলব্ধির তরিকা—''আগে আমাকে বোঝ, তারপর ঠাকুরকে বুঝবে।" স্বামীজী তাঁর কথায়, ভাষণে, বিভিন্ন রচনার মধ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবকে যুগোপযোগী করে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দের জীবন, বাণী ও কর্ম—শ্রীরামকৃষ্ণজীবন, বাণী ও

ভাবের প্রকাশক। এ যেন সেই ভাবপরম্পরারই প্রবাহ—যা ভারতের চিরন্তন ঐতিহ্য।

স্বামীজী বলেছেন : ''কোন জাতিকে এগিয়ে যেতে হলে তার উচ্চ আদর্শ থাকা চাই। সেই আদর্শ অবশ্যই পরব্রহ্ম। কিন্তু যেহেতু তোমরা সকলেই বিমূর্ত আদর্শের (abstract ideal) দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে পারবে না, তোমাদের একটি ব্যক্তি-আদর্শের (personal ideal) একান্ত প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে তোমরা সেই আদর্শ পেয়েছ। অন্য কেউ এযুগে আমাদের আদর্শ হতে পারেন না।... আমাদের আজ এমন মানুষের প্রয়োজন, বর্তমান যুগের প্রতি যাঁর সহানুভূতি আছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মধ্যে আমাদের এই প্রয়োজন মিটেছে। আজ প্রত্যেকের সামনেই তাঁকে তুলে ধর। সাধু বা অবতার যেভাবেই তাঁকে গ্রহণ কর না কেন—কিছু যায় আসে না।''

স্বামী বিবেকানন্দ নিবেদিতাকে একটি চিঠিতে (৭.৬.১৮৯৬) লিখেছেন : ''আমার আদর্শকে বস্তুতঃ অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করা চলে, আর তা এই—মানুষের কাছে তার অন্তর্নিহিত দেবত্বের বাণী প্রচার করতে হবে এবং সব কাজে সেই দেবত্ব-বিকাশের পন্থা নির্ধারণ করে দিতে হবে।''

নতুন যুগের আচার্য স্বামীজী তাঁর জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা সারদা দেবীকেই প্রকাশ করেছেন। স্বামীজীর আদর্শের প্রথমটি যেন ঠাকুরেরই সমগ্র জীবনের মূর্তরূপ আর দ্বিতীয়টি শ্রীমা সারদা দেবীর জীবনে প্রকাশিত। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ছিল ঈশ্বরনির্ভর—তিনি যেন জগদম্বার বালক। ঠাকুর মানুষের চৈতন্যের জাগরণের জন্য তাদের দোরে দোরে ছুটে গেছেন। আর শ্রীমা রামকৃষ্ণ-আদর্শের রূপায়ণ। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-ভাবধারার প্রয়োগকর্ত্রী। তিনি সংসারের সমস্যাসঙ্কুল জীবনে থেকে, সংসারের সকল দায়িত্ব-কর্তব্য নিখুঁতভাবে সামলিয়েও মনকে উচ্চতানে রেখে দেখিয়েছেন, ঠাকুরের আদর্শগুলির প্রয়োগ এই সংসারজীবনেও সম্ভব। মায়ের জীবন দেখে, উপলব্ধি করেই মানুষের সেই বিশ্বাস আসবে।

ঠাকুর হলেন আদর্শ। আর মায়ের জীবন হল সেই উচ্চ আদর্শের ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত। ঠাকুর ও মায়ের নাম উল্লেখ না করে স্বামীজী তাঁর জীবনের আদর্শকে উভয়ের জীবনাদর্শের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে যেন তাঁদের জীবনের ব্যাখ্যাকার হয়ে গেলেন।

স্বামীজী একটি চিঠিতে (১৮৯৪) লিখছেন, শ্রীরামকৃষ্ণ 'সবচেয়ে আধুনিক এবং পূর্ণবিকশিত চরিত্র।' আর একটি চিঠিতে (২৭.৪.১৮৯৬) লিখেছেন : ''পুরানো ঠাকুর-দেবতা বুড়িয়ে গেছে—এখন নতুন ভারত, নতুন ঠাকুর, নতুন ধর্ম, নতুন বেদ।'' অভিন্নহৃদয় গুরুভ্রাতা স্বামী ব্রহ্মানন্দকে স্বামীজী জানিয়েছেন (১৮৯৫) : ''যেদিন রামকৃষ্ণ জন্মেছেন, সেইদিন থেকেই Modern India—সত্যযুগের আবির্ভাব! আর তোমরা এই সত্যযুগের উদ্বোধন কর—এই বিশ্বাসে কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও।'' অন্য একটি চিঠিতে (১৮৯৫) : ''তিনি (শ্রীরামকৃষ্ণ) যেদিন থেকে জন্মেছেন, সেদিন থেকে সত্যযুগ এসেছে। এখন সব ভেদাভেদ উঠে গেল, আচণ্ডাল প্রেম পাবে। মেয়ে-পুরুষ-ভেদ, ধনী-নির্ধনের ভেদ, পণ্ডিত-মূর্খ-ভেদ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল-ভেদ—সব তিনি দূর করে দিয়ে গেলেন। আর তিনি বিবাদভঞ্জন—হিন্দু মুসলমান-ভেদ, ক্রিশ্চান-হিন্দু ইত্যাদি সব চলে গেল। ওই যে ভেদাভেদে লড়াই ছিল, তা অন্য যুগের; এ সত্যযুগে তাঁর প্রেমের বন্যায় সব একাকার।''

অধ্যাত্মভারতের সাধারণ মানুষ নানা শাস্ত্রীয় তত্ত্বকে সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে প্রয়োগ করতে চায়। ভারতীয় চিন্তনের একটি সুপ্রচলিত তত্ত্ব হল—'ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা'। 'মিথ্যা' শব্দের প্রকৃত অর্থ না জেনে এবং বেদান্তের তত্ত্বের প্রকৃত উপলব্ধি না থাকায় একসময় ভারতবর্ষের মানুষ জীবন ও জগতের প্রতি উদাসীন হতে শুরু করেছিল। সে-অনাসক্তি ক্লীবের তামসিক অনাসক্তি। 'সবই মায়া'—এই চিন্তাধারার ব্যাপক প্রচারের ফলে ঐহিক উন্নতির প্রচেষ্টায় আলস্য এসেছিল। আত্মশক্তির স্বরূপ ভুলে মানুষ চরম দারিদ্র্য, অশিক্ষা, অবক্ষয়, পরাধীনতা, দাসসুলভ দুর্বলতার পঙ্কিল প্রবাহে নিমজ্জিত থেকে মূর্খের স্বর্গসুখ ভোগ করছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ ওই মায়াবাদের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। শক্তির বিবিধ প্রকাশকে 'মিথ্যা' বলে অবহেলা না করে তাকে 'জগন্মাতার লীলা' বলে অভিহিত

করলেন। শাস্ত্রের 'জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ' অর্থাৎ জীব ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়—'যো কুছ হ্যায় সো তুঁহি হ্যায়' এই তত্ত্বকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। সর্বজীবে ব্রহ্মদর্শন করে জীবজগতের উন্নতি ও তাদের কল্যাণের দিকে মানুষের দৃষ্টিকে ফিরিয়ে আনলেন। এভাবেই জগৎশরীরে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করলেন তিনি।

ব্রহ্ম, জীব, শিব—একাকার হয়ে গেছে ঠাকুরের কাছে। সেই অনুভূতির উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন তিনি নরেনকে। এইজন্যই স্বামীজীকে বারবার বলতে শুনি : ''দরিদ্র, অজ্ঞ, কাতর—এরাই আমার ঈশ্বর।'' জগতের ভালো-মন্দ সবই নারায়ণ। অশিক্ষিত, বুভুক্ষু, নিরন্ন, আর্ত—এরাও নারায়ণ, ব্রহ্ম স্বয়ং। এই সমানুভূতির ফলে জাত সহানুভূতি—এর ফলেই আসতে পারে জগৎকল্যাণে প্রবৃত্তি। শ্রীরামকৃষ্ণ এভাবেই নরেনের মধ্যে বেদান্তের নির্যাস ঢুকিয়ে তাঁকে জগতের কল্যাণে ব্রতী করেছেন।

'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্মঃ'—বেদান্তের এই নির্যাসটুকু না উপলব্ধি করলে, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—এই অভেদত্বটুকু না জানলে জগতের কল্যাণ করা সম্ভব নয়। অগ্নিকে স্বীকার করলে তার দাহিকাশক্তিকে স্বীকার করতে হয় এবং উভয়ের বন্ধন অচ্ছেদ্য। তাই অখণ্ডের ঘরের নরেন যখন সমাধির আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকাকে তাঁর পরম কাঙ্ক্ষিত বলে মত প্রকাশ করলেন, তিরস্কার করলেন ঠাকুর। যে-সমাধিকে ভারতীয় ধর্ম, দর্শন সাধকজীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য বলে অভিহিত করেছে, তার থেকেও উচ্চ অবস্থার সন্ধান দিলেন তিনি ভাবী যুগাচার্যকে। এক মাহেন্দ্রক্ষণে ঠাকুরের মুখ থেকে নরেন শুনলেন সর্বশাস্ত্র মন্থনের ফলে উত্থিত অমৃত-মন্ত্র—''জীবে দয়া নয়, শিবজ্ঞানে জীবের সেবা।'' নতুন আলোকে আলোকিত হলেন নরেন্দ্রনাথ। জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও কর্মের সার্থক সমন্বয় ঘটালেন 'সেবাযোগে'। বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে রূপায়িত করলেন। তাত্ত্বিক বেদান্তের প্রায়োগিক রূপের পথপ্রদর্শক তিনি। পূর্ব পূর্ব যুগে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব—এই তত্ত্বগুলি শুধুমাত্র ব্যক্তি সাধকের সাধনার অঙ্গ ছিল। এই সাধনার মঙ্গলময় প্রয়োগ সমাজজীবনে কী যুগান্তকারী, সদর্থক প্রভাব ফেলতে পারে তা দেখিয়ে গেলেন নবীন যুগের নবীন আচার্য স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী তুরীয়ানন্দজীকে বলেছেন : ''হরি ভাই, এবার একটা নতুন পথ করে গেলাম। আগে লোকে জানত ধ্যান করে, তপস্যা করে, জ্ঞান-ভক্তি—এসব অবলম্বন করে মানুষ ভগবান লাভ করে। এবার বুভুক্ষু মানুষ, নিরন্ন মানুষ, অজ্ঞানী মানুষ—এদের সেবার দ্বারা ধর্মলাভ হবে।'' নতুন যুগের আচার্যের এ এক নতুন ধারার প্রবর্তন। 'সেবাযোগ'কে বলা হয় তৃতীয় নিরপেক্ষ পথ। এতদিন ছিল জ্ঞানমার্গ, ভক্তিমার্গ; কিন্তু স্বামীজী দেখালেন কর্মের মধ্য দিয়ে, সেবার মধ্য দিয়ে এক নিরপেক্ষ পথ। সেবক নিজে এবং যার সেবা করছে, যার প্রতি কর্ম করছে—উভয়ে যে আলাদা নয়—এই অদ্বৈততত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্বের বাস্তব প্রয়োগের মাধ্যমে স্বামীজী নতুনভাবে আত্মতত্ত্বের বিস্তার ঘটালেন।

স্বামীজী প্রবর্তিত সেবাযোগের মাধ্যমে যে মুক্তি সম্ভব, সেই দৃঢ় বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে পরবর্তী কালে কাশী সেবাশ্রমের কর্মযজ্ঞের প্রশংসা করে হরি মহারাজ বলেছিলেন, ''তিনদিন যে নারায়ণজ্ঞানে রোগীদের সেবা করবে তার মুক্তি করামলকবৎ।''

প্রতিটি কাজই মানুষকে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দিতে পারে—স্বামীজীর জীবন অনুধাবন করে সিস্টার নিবেদিতা এই সত্য উপলব্ধি করেছিলেন, তাই তাঁর বিখ্যাত উক্তি : ''স্বামীজী জাগতিক ও পারমার্থিকের ভেদ দূর করে দিয়ে গেছেন।'' জাগতিক ও পারমার্থিক কর্মের বিভেদরেখা ঘুচে গেল। ঠাকুরের জীবনবেদ অনুধাবন করে নতুন যুগের আচার্য প্রচার করলেন—সমস্ত কাজই আসলে ঈশ্বরের পূজা—পরমার্থে পৌঁছানোর উপায়। স্বামীজীর 'বাণী ও রচনা'র ভূমিকায় নিবেদিতা উল্লেখ করেছেন—স্বামীজী যখন বলতে শুরু করলেন, তখন যেন সনাতন হিন্দুধর্মের কথাই বলছেন, যখন শেষ করলেন, নতুন হিন্দুধর্ম সৃষ্টি হল। স্বামীজী সনাতন হিন্দুধর্মকেই যুগোপযোগী করে মানুষের কাছে আনলেন। নতুন যুগের যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক, উদার মানুষের চাহিদা, আগ্রহ ও প্রয়োজনের কথা বুঝে ধর্মকে সংস্কার করলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের সমন্বয়চিন্তার একটি প্রকাশ—জগৎকল্যাণ ও ঈশ্বরলাভের জন্য সন্ন্যাসী ও গৃহী উভয়কে উৎসাহিত করা। বৈদিক ঋষিরা সকলে গৃহী ছিলেন, সংসারে থেকেই তাঁরা সর্বভূতে ব্রহ্মদর্শন করতেন। কিন্তু বৌদ্ধযুগে সন্ন্যাসকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়ায় গৃহিজীবন চরম অবজ্ঞা ও অবহেলার মধ্যে পড়ে এবং সমাজদেহটি দুর্বল হয়ে যায়। বৈদেশিক শক্তির দ্বারা ভারতবর্ষের বারংবার পরাধীনতার এটি একটি অন্যতম কারণ। স্বামীজী ঠাকুরের জীবনে সন্ন্যাসী ও গৃহী—উভয়ের আদর্শেরই চরম ও পূর্ণ প্রকাশ দেখে আদর্শ গৃহীর ধর্ম এবং সমাজজীবনে তার প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি উপলব্ধি করেছিলেন। 'স্বামীজীকে যেরূপ দেখিয়াছি' গ্রন্থে পাই, অতীত ও বর্তমান ভারতের বিষয় আলোচনা করতে করতে নিবেদিতাকে স্বামীজী বলেছেন : ''এতদিন ভারতবর্ষে দুটি কথাই যেন প্রচলিত ছিল—ত্যাগ আর মোক্ষ। এছাড়া কি গৃহীদের জন্য কিছু নেই? তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাটি আমি করে যাব।'' সেইজন্য রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করে সন্ন্যাসীদের সঙ্গে মিশনের সদস্য হিসেবে তিনি গৃহিভক্তদেরও সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ'—সঙ্ঘের এই ভাবাদর্শ গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গৃহী একাধারে সংসারজীবন গ্রহণ করে আদর্শ গৃহী হবে আবার সমাজের উন্নয়নে নিজেদের নিয়োজিত করবে, আর ত্যাগীরা ত্যাগের ভাবকে জীবনে পরিস্ফুট করবে এবং আত্মমুক্তির চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে জগতের হিতসাধন করবে।

উদার দৃষ্টিসম্পন্ন নবীন আচার্য সন্ন্যাসিসঙ্ঘ স্থাপনের জন্য প্রাণপাত করেছেন, আবার সেইসঙ্গে সন্ন্যাস আশ্রমের দোষটি নির্দেশ করতে বিন্দুমাত্র সংকোচ বোধ করেননি। তাই 'স্বামি-শিষ্য-সংবাদ'-এ তাঁকে বলতে শুনি—সন্ন্যাসের এই এক দোষ যে cream of the society সন্ন্যাস আশ্রমে চলে আসে বলে সমাজদেহটি দুর্বল হয়ে যায়। সমাজকে চালানোর মতো ভালো মানুষ থাকে না। এই খামতি দূর করার জন্য স্বামীজী গৃহীদের উন্নয়নে গুরুত্ব দিলেন। ত্যাগের প্রতি তীব্র আকর্ষণ যাদের, সেই মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ সন্ন্যাসী হলেও সমাজের বিপুল সংখ্যক মানুষ আদর্শ গৃহীর জীবনযাপন করে সমাজদেহকে সবল করবে। তবে এই গৃহীরাও ঈশ্বরলাভে বঞ্চিত হবে না। তার উপায়ও তারা ঠাকুরের জীবন ও উপদেশ থেকে পাবে।

এযুগের আচার্য স্বামীজী মানুষকে কখনও বলছেন না—সন্ন্যাসলাভ, মোক্ষলাভই জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য। বলছেন : ''Man-making is my mission.'' ত্যাগী এবং গৃহী—যে-পথ যার অনুকূল সে সেটা গ্রহণ করবে—কিন্তু সর্বাগ্রে 'মানুষ' হতে হবে। তবেই জগতের সর্বোত্তম কল্যাণ। ''মানুষ চাই, মানুষ চাই, আর সব হয়ে যাবে।''

'Original Sin' খ্রিস্টীয় ভাবাদর্শের একটি তত্ত্ব—মানুষকে পাপী ভাবা এ-ধর্মের এক বিশেষত্ব। কিন্তু স্বামীজী কম্বুকণ্ঠে বলে উঠলেন : ''মানুষকে পাপী বলাই পাপ।'' 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' মানুষ, তার মধ্যে রয়েছে নিঃসীম পূর্ণতা, দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব। সেটাই মানুষের স্বরূপ। 'পাপতত্ত্বের' বিরোধিতা করে স্বামীজী পাশ্চাত্যকে জানালেন—মানুষ নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে যায় এই মাত্র; কেউ ক্ষুদ্র নয়, তুচ্ছ নয়। সবার মধ্যে রয়েছে অনন্ত সম্ভাবনা—''Each soul is potentially divine. Our goal is to manifest this divinity within by controlling nature internal and external.'' পাশ্চাত্য মানুষের সঙ্গে এদেশের মানুষকে আত্মবোধে উদ্দীপিত করতে, আত্মবলে বলীয়ান করতে তাঁর এই নতুন বার্তা।

মেরি হেলকে এক চিঠিতে (৩০.১০.১৮৯৯) স্বামীজী লিখেছেন : ''আমরা এক নতুন ভারতের সূচনা করেছি—যথার্থ উন্নত ভারত, পরের দৃশ্যটুকু দেখবার অপেক্ষায় আছি।'' সেই দৃশ্যটা কীরকম হবে? সেটিও স্বামীজী এঁকে গেছেন 'পরিব্রাজক' গ্রন্থে। মানসচক্ষে তিনি দেখেছেন : ''নতুন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির ভেদ করে, জেলে মালা মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।

বেরুক ঝোড় জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে।" অর্থাৎ সাধারণ মানুষ যারা যুগ যুগ ধরে অবজ্ঞা পেয়েছে, অপমান লাঞ্ছনার শিকার হয়েছে—তাদের উত্থান হবে। স্বামীজী তাঁর ত্রিকালদর্শী দৃষ্টির দ্বারা বুঝেছিলেন—এদের শক্তিতেই দেশের উন্নয়ন হবে। জনসাধারণ ও নারীকে পদদলিত করা—এই দুটিকে তিনি 'জাতীয় পাপ' বলেছেন। জাতি ও দেশকে জাগাতে হলে এই জনগণেশকে আগে জাগাতে হবে। এদের শিক্ষিত করতে হবে। এদের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে সর্বপ্রকার সহায়তা।

শক্তির জাগরণ, শক্তির স্বীকৃতি, সম্মান ছাড়া সব নিষ্ফল। ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ—এই শিক্ষা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে তিনি পেয়েছিলেন। তাই পুঁথিকার অক্ষয়কুমার সেন 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-পুঁথি'-তে শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের স্তুতি করলে তাঁকে স্বামীজী স্মরণ করিয়ে দেন ঠাকুরের স্তুতির সঙ্গে সঙ্গে মায়ের স্তুতি, শক্তির স্তুতি আবশ্যক। কারণ, মহামায়া তুষ্ট হয়ে দ্বার না ছাড়লে ব্রহ্মজ্ঞান লাভও অসম্ভব। শিবানন্দ মহারাজকে চিঠিতে লিখছেন স্বামীজী : ''শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার নাই।"

নারীশক্তির উদ্বোধন ভিন্ন জগতের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। নারীকে কোন মর্যাদার স্থান দেওয়া যায়, তার পরিচয় স্বামীজী প্রত্যক্ষ করেছিলেন ঠাকুরের জীবনে। নারীশক্তি-উদ্বোধনে নতুন দিগন্ত উন্মোচনের উৎসক্ষেত্র বলে শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন চিহ্নিত হয়েছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের ভাষ্যকার বিবেকানন্দ তাই ব্যবহারিক জগতে নারীকে শ্রদ্ধার স্থান দেওয়ার অন্যতম পথিকৃৎ। সন্ন্যাসিসঙ্ঘের সঙ্ঘজননী-রূপে শ্রীমা সারদাকে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন তিনি। পৃথিবীর ইতিহাসে এটি বিরলতম ও নবীনতম সংযোজন। কী বিস্ময়কর, বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত! সন্ন্যাসিসঙ্ঘের সঙ্গে নারীর সংস্রব সর্বযুগেই অকল্পনীয়, সেই অকল্পনীয় বিষয়টির বাস্তবায়ন ঘটালেন তিনি। নারীজাগরণ, নারীউন্নয়ন, নারীমুক্তি, নারীস্বাধীনতা—এই যে নতুন দিগন্তের সদর্থক উন্মোচন, তা 'মা'কে কেন্দ্র করেই ঘটবে। মাকে কেন্দ্র করে আবার গার্গী-মৈত্রেয়ীরা জন্মাবে। আর তাঁকেই কেন্দ্র করে স্বামীজী নারীমঠ স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। মেয়েরাও সন্ন্যাসগ্রহণ করতে পারবে। মেয়েরা স্বাধীন হবে, শিক্ষিত হবে, নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে। নারীর মধ্যেও সেই ব্রহ্মসত্তা বিরাজিত। সেই ব্রহ্মসত্তার বিকাশসাধন তারা পুরুষ-নিরপেক্ষ হয়ে, আত্ম-প্রচেষ্টার দ্বারাই করবে। আমেরিকায় থাকাকালে স্বামীজী তাঁর এক শিষ্যা মেরি লুইকে সন্ন্যাসব্রতে দীক্ষিত করে 'অভয়ানন্দ' নাম দিয়ে নবযুগে নারীর সন্ন্যাসগ্রহণের সূচনা করে যান।

হিন্দুসমাজের বর্ণবিভাগ অনুসারে জন্মসূত্রে নরেন্দ্রনাথ ছিলেন কায়স্থ। কায়স্থ হয়েও ভারতীয় হিন্দু-সমাজের তথাকথিত ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে সন্ন্যাসগ্রহণ করলেন তিনি। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলেই যে ত্যাগব্রতের অধিকারী—সেটিই যেন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করলেন। তৎকালীন দেশাচার, লোকাচারের বিরুদ্ধাচরণ করে, কুৎসা, সমালোচনা, নিন্দাকে উপেক্ষা করে কালাপানি পার হয়ে পাশ্চাত্যে গেলেন ধর্মপ্রচারের জন্য।

পূর্ব পূর্ব যুগের প্রখ্যাত আচার্যরা শাস্ত্রব্যাখ্যা, ভাষ্য রচনা করেছেন ভারতবর্ষের এলিট শ্রেণির বোধগম্য সংস্কৃত ভাষায়। এই ভাষার কঠিন খোলস অনেক সময়েই ভারতবর্ষের সুউচ্চ দার্শনিক চিন্তার ঐতিহ্যকে সাধারণ মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। কিন্তু স্বামীজী ভারতীয় সুপ্রাচীন ঐতিহ্য, কৃষ্টি এবং নব্য হিন্দুধর্মকে জনসমক্ষে আনলেন সমগ্র বিশ্বের কাছে গ্রহণযোগ্য ভাষা ইংরেজিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর গুরুভাই, শিষ্য-শিষ্যা, অনুরাগী ও অনুগামীদের নির্দেশ দিলেন তাঁর ইংরেজি রচনা, বক্তৃতা, পত্রাদি যেন ভারতীয় প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে সাধারণের উপযোগী করে তরজমা করে প্রকাশ করা হয়। তাঁর অধিকাংশ বক্তৃতা, রচনা, পত্র ইংরেজি ভাষায় আর সামান্য কিছু রচনা ('প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক', 'বর্তমান ভারত', 'ভাববার কথা' প্রভৃতি গ্রন্থ, বেশ কিছু কবিতা, গান ও স্তব) বাংলাতে রচিত, দুটি চিঠি ও কিছু স্তব-স্তুতি এবং প্রণামমন্ত্র সংস্কৃতে; আর একটি চিঠি ফরাসিতে লেখা।

স্বামীজী আধুনিক বাংলাভাষার রূপকার। তিনি

সমসময়ের কথ্য গদ্যে প্রাণ এনেছেন, শক্তিসঞ্চার করেছেন। অবিসংবাদিতভাবে তাঁর আধ্যাত্মিক সাহিত্য অতি উচ্চস্তরের। আবার চরিত্রগঠন, দেশগঠন, সমাজগঠন, রাষ্ট্রগঠন, পৃথিবীর একত্ব—এসমস্ত দিক থেকে মানুষের উত্থানমূলক, অনুপ্রেরণামূলক, উদ্দীপনাদায়ী সাহিত্যের রচয়িতা স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজী তাঁর 'উদ্বোধন'-এর জন্য জাহাজে বসেই লেখা শুরু করেছিলেন। সিসিলির কাছে ভূমধ্যসাগরে ভাসতে ভাসতে বাংলা গদ্যকে ইচ্ছাকৃতভাবে তার পরিচিত চলন, তার স্বীকৃত ব্যাকরণের বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন। ইংরেজি ভাষা নিয়ে কার্লাইল যেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, জন্ম দিয়েছিলেন এক নতুন রীতির ইংরেজি গদ্যের, বিবেকানন্দের বাংলাও যেন তেমন—লিখেছেন নিবেদিতা। ১৮৯৯ সালে আটত্রিশ বছরের রবীন্দ্রনাথ বাংলা গদ্যের ব্যবহারে এতখানি দুঃসাহসী হয়ে ওঠেননি। বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যকে কতখানি নতুন স্বাদে-গন্ধে-বর্ণে সাজাতে পেরেছিলেন তাঁর 'পরিব্রাজক' পড়লে তা অনুধাবন করা যায়।

ঔপনিবেশিক যুগের প্রফেট হয়েও স্বামীজী কেন কালোত্তীর্ণ তার একটি যুক্তি হল, তৎকালেই তিনি দার্শনিক ও বিজ্ঞানীদের আহ্বান করেছেন মাতৃভাষায় উচ্চ উচ্চ তত্ত্বের ফসল প্রকাশ করতে। তিনি লিখেছেন : ''যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে এসকল তত্ত্ববিচার কেমন করে কর?''

ধর্ম ও পাপের নতুন সংজ্ঞা দিলেন স্বামীজী। বললেন : ''পরোপকারই ধর্ম, পরপীড়নই পাপ; শক্তি ও সাহসিকতাই ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতাই পাপ। স্বাধীনতাই ধর্ম, পরাধীনতাই পাপ।'' যে-ধর্ম বিধবার অশ্রুমোচন করতে পারে না, অনাথ বালকের মুখে একখণ্ড রুটি তুলে দিতে পারে না—সেই ধর্মে তিনি বিশ্বাসী নন। আস্তিকতা-নাস্তিকতারও নতুন সংজ্ঞা দিয়ে স্বামীজী বললেন—পুরনো ধর্ম বলত, যে ঈশ্বরে বিশ্বাস করে না সে-ই নাস্তিক আর নতুন ধর্ম বলে যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক; যে নিজেকে বিশ্বাস করে সেই আস্তিক। এমন কোনও যুক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানমনস্ক, উদার মানুষ নেই, যে আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী। নৈতিকতার মধ্যেও যে আত্মোন্নতি ও জগৎকল্যাণের বীজ নিহিত আছে সেটিও অতি সংক্ষেপে সংজ্ঞায়িত করলেন : ''যাকিছু স্বার্থশূন্য তা-ই নৈতিক আর যাকিছু স্বার্থপূর্ণ তা-ই অনৈতিক।'' ধর্ম, আস্তিকতা ও নৈতিকতার এই নতুন সংজ্ঞা বর্তমান যুগে আধুনিক উন্নত সমাজ গঠনে সহায়ক। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন থেকে তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা, যুক্তিনিষ্ঠা, বিশেষত উদারতা—এগুলিকে সমন্বিত করে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্ম, আস্তিকতা ও নৈতিকতাকে তাত্ত্বিক থেকে ব্যবহারিক দিকে প্রবাহিত করে দিলেন।

স্বামীজী আত্মতত্ত্ব উপলব্ধিকে আর সাধকের ব্যক্তিগত অধ্যাত্ম-সিদ্ধিতে বদ্ধ না রেখে তাকে জগৎকল্যাণে, জগতের উন্নয়নে যুক্ত করলেন; তার এক আন্তর্জাতিক রূপ দিলেন, এক নতুন মাত্রা যোগ করলেন, এক নতুন দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করলেন। যদি কোনও ব্যক্তি জানে যে তার মধ্যে নিহিত আছে পূর্ণতা ও দেবত্ব—তাহলে সে সেই বলে বলীয়ান হয়ে সর্ববিষয়ে উন্নত হয়ে উঠবে। ছাত্র আরও ভালো ছাত্র হবে, শিক্ষক আরও ভালো শিক্ষক হবে, মুচি আরও ভালো মুচি হবে, উকিল আরও ভালো উকিল হবে। স্বামীজী বলেছেন, ''তোমরা নিজেদের স্বরূপ চিন্তা কর এবং সর্বসাধারণকে ওই শিক্ষা দাও। ঘোর মহানিদ্রায় অভিভূত জীবাত্মার নিদ্রাভঙ্গ কর। আত্মা প্রবুদ্ধ হলে শক্তি আসবে, মহিমা আসবে, সাধুত্ব আসবে, পবিত্রতা আসবে—যা কিছু ভালো সবই আসবে।'' ফলে নতুন শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে নতুন সমাজ গঠিত হবে।

স্বামীজী তাঁর নিরপেক্ষ দৃষ্টির মাধ্যমে বিশ্বায়নের ব্যাপারটি উপলব্ধি করেছিলেন। কোনও প্রয়োজন বা সমস্যা কোনও বিশেষ শ্রেণি, দেশ বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ থাকবে না। সবকিছুই আন্তর্জাতিক হয়ে পড়ছে। স্বামীজী এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেছেন : ''রাজনীতি ও সমাজনীতির ক্ষেত্রেও যে-সব সমস্যা

কুড়ি বছর আগে শুধু জাতীয় সমস্যা ছিল, এখন আর জাতীয় ভিত্তিতে সেগুলির সমাধান করা যায় না। সে সমস্যাগুলি ক্রমশ বিপুলায়তন হচ্ছে, বিরাট আকার ধারণ করছে। আন্তর্জাতিক ভিত্তিরূপ প্রশস্ততর ভূমি থেকেই তাদের মীমাংসা করা যেতে পারে। আন্তর্জাতিক সংহতি, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ, আন্তর্জাতিক বিধান—এই এযুগের মূলমন্ত্র। সকলের ভিতর একত্ব-ভাব বিস্তৃত হচ্ছে, এই তার প্রমাণ।"

জগতের কল্যাণের মাধ্যমটি যে রাজনীতিই—এব্যাপারে বিশ্বের প্রায় সব কল্যাণকামী রাজনীতিবিদ, সমাজবিদ বা অর্থনীতিবিদ একমত। স্বামী বিবেকানন্দই প্রথম ঘোষণা করলেন : ''ঈশ্বর এবং সত্যই আমার রাজনীতি।" আলাসিঙ্গাকে ২৭.৯.১৮৯৪ তারিখের চিঠিতে লিখলেন : ''প্রকৃতপক্ষে কিন্তু আমি একজন রাজনীতিক নই, অথবা রাজনৈতিক আন্দোলনকারীও নই। আমার লক্ষ্য কেবল ভেতরের আত্মতত্ত্বের দিকে, সেইটি যদি ঠিক হয়ে যায়, তবে আর সবই ঠিক হয়ে যাবে—এ আমার মত।" আধুনিকোত্তর প্রফেট হয়েও রাজনীতিতে তাঁর আস্থা ও নির্ভরতা বিন্দুমাত্র ছিল না। সর্বোপরি, রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সদস্যদের সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে কোনও সংস্রব থাকবে না বলে চিরকালের জন্য নিষেধাজ্ঞা জারি করে গেছেন। কী অপরিমেয় দূরদৃষ্টি থাকলে আধুনিক জগতের আচার্য হয়েও রাজনীতিকে পরিহার করে কেউ জগৎকল্যাণের ভাবনায় এরূপ মগ্ন এবং তৎপর থাকতে পারে স্বামী বিবেকানন্দকে না জানলে তা জগৎ জানতে পারত না।

অপরকে স্বীকৃতিদান, বিভিন্ন মতের সমন্বয়সাধন—এটিও নবীন যুগের আচার্যের উদার দৃষ্টিভঙ্গির ফসল। বর্জন নয়, গ্রহণ—এটি হল ভারতবর্ষের এক অনন্য গুণ। তাকে পুনর্জীবন দিলেন স্বামীজী। শিকাগো বক্তৃতার শেষে বললেন : ''শীঘ্রই প্রত্যেক ধর্মের পতাকার ওপর লেখা হবে, 'বিবাদ নয়, সহায়তা; বিনাশ নয়, পরস্পরের ভাবগ্রহণ; মতবিরোধ নয়, সমন্বয় ও শান্তি।' "

কূপমণ্ডুক দৃষ্টিভঙ্গি কখনও তাঁর ছিল না, আর সন্ন্যাসীর ক্ষেত্রে তা থাকা উচিতও নয়। সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হয়ে মাতৃভূমিকে ভালোবাসা যে তাঁর চরিত্রের অন্যতম দুর্বলতা—একথা স্বীকার করেও তিনি দেশ-জাতির সীমা অতিক্রম করে বললেন : ''আমি যেমন ভারতের, তেমনি এই জগতের।" যাঁর জীবনের ভাষ্যকার স্বামীজী, সেই শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবাদর্শটি সমগ্র জগতের কল্যাণের জন্য। জগতের কল্যাণে তাঁর আগমন। স্বামীজী ভারতের সনাতন ধর্ম, আদর্শ—পাশ্চাত্য ও ভারতবর্ষের সর্বপ্রান্তে প্রচার করলেন। তিনি বললেন : ''ভগবান বুদ্ধের প্রাচ্যের জন্য যেমন একটা বাণী ছিল, আমার রয়েছে পাশ্চাত্যের জন্য একটি বাণী।" সেটি কী? পাশ্চাত্যের ভোগসর্বস্ব কর্মমুখী জীবনে অধ্যাত্মভাব সঞ্চার করা, তাদের কর্মকে কর্মযোগে পরিণত করা। আর প্রাচ্যের তমোময় জনজীবনে তিনি রজোগুণের জাগরণ আনতে চেয়েছেন। সেজন্য প্রয়োজন ভারতের ঐহিক উন্নতি। আর তা সম্ভব পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তায়। অর্থাৎ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পরস্পর তাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদের—অধ্যাত্মবিজ্ঞান ও জড়বিজ্ঞানের আদান-প্রদান ঘটাবে। উভয়ের যথাযথ সমন্বয়েই কেবলমাত্র এই জগতের উন্নতি সম্ভব হবে।

শাস্ত্রে আলোচিত 'সর্বমুক্তি'র ধারণাটির বাস্তব প্রয়োগ ঘটালেন স্বামীজী। তিনি বলছেন : ''যতক্ষণ একটা কুকুর পর্যন্ত অভুক্ত থাকবে, ততক্ষণ আমার ধর্ম হচ্ছে তাকে খাওয়ানো। যতক্ষণ কেউ বদ্ধ থাকছে, ততক্ষণ তাকে মুক্ত করাই আমার কাজ।" সকলকে একসঙ্গে নিয়ে এগোতে হবে। একার উন্নতি স্বার্থপরতা। সর্বমঙ্গল—সকলের উন্নতির চেষ্টাই হল মহাপ্রাণতা। তাই তাঁর দেওয়া motto—আত্মমুক্তি ও জগতের হিত—দুটিই ওতপ্রোতভাবে জড়িত, একে অন্যের পরিপূরক।

কোনও হীনবীর্য, পরাধীন, ক্লীবতায় পূর্ণ জনজাতির পক্ষে আত্মতত্ত্ব কিংবা সর্বমুক্তির ধারণাটি উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। তার জন্য চাই স্বাধীনতা। যেকোনও উন্নয়নের প্রথম শর্ত স্বাধীনতা। পরাধীনতার জ্বালা প্রাণে প্রাণে অনুভব করেছিলেন স্বামীজী। স্বামীজীর কাছে একবার একদল মানুষ ধর্মকথা শুনতে এসেছিলেন। সর্বত্যাগী অথচ দেশপ্রেমিক স্বামী

বিবেকানন্দ গর্জে উঠে বলেছিলেন : ''পরাধীন দেশের আবার ধর্ম কী? আগে নিজের দেশকে স্বাধীন করুন, তারপর ধর্মের কথা বলা যাবে।''

শ্রীরামকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণ (১৮৮৬)-এর পর বরানগরের এক ভুতুড়ে বাড়িতে ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা সনাতন ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের চিরাচরিত ধারায় কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন, ধ্যান-তপস্যায় মগ্ন হলেন। আত্মজ্ঞানলাভ, ঈশ্বরলাভই ছিল এই কঠোর জীবনযাপনের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু ঠাকুরের কাছ থেকে পাওয়া ভারতের ও জগতের কল্যাণসাধনের দায় স্বামীজীকে স্থির থাকতে দেয়নি। ভারত পরিব্রাজন করে তিনি দেশ তথা দেশের মানুষকে জেনেছেন ও তাদের সামগ্রিক উন্নতির পথটি অনুসন্ধান করেছেন। এরপর ধর্মমহাসভার উদ্দেশ্যে তাঁর পাশ্চাত্যে গমন। সেখান থেকে গুরুভাইদের কাছে পত্রের মাধ্যমে নতুন যুগোপযোগী নানা বৈপ্লবিক বার্তা পাঠাতে শুরু করলেন : ''সব ত্যাগ করেছ এখন শান্তির ইচ্ছা, মুক্তির ইচ্ছাটাকেও ত্যাগ করে দাও তো বাবা। কোনও চিন্তা রেখো না; নরক, স্বর্গ, ভক্তি, মুক্তি সব don't care। আপনার ভালো কেবল পরের ভালোয় হয়। আপনার মুক্তি এবং ভক্তিও পরের মুক্তি ও ভক্তিতে হয়—তাইতে লেগে যাও, মেতে যাও, উন্মাদ হয়ে যাও।'' এই হল এযুগের নতুন তত্ত্ব, নতুন ভাবনা, নতুন দর্শন। সন্ন্যাসের এক নতুন ধারার প্রবর্তন করলেন যুগাচার্য। ২৬ মে ১৯০০-র চিঠিতে লিখলেন : ''আমাদের অঙ্গের গৈরিক বাস তো যুদ্ধক্ষেত্রের মৃত্যুসজ্জা! ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রাণপাত করাই আমাদের আদর্শ, সিদ্ধির জন্য ব্যস্ত হওয়া নয়।''

বরানগর মঠে ত্যাগপূত কৃচ্ছ্রতা, তপস্যা-সমৃদ্ধ চিরাচরিত সন্ন্যাসজীবন এবং পরবর্তী ক্ষেত্রে কর্মময় সন্ন্যাসজীবন! এই রূপান্তর কেন? স্বামী বোধানন্দের জিজ্ঞাসার উত্তরে স্বামীজী বলেছিলেন : ''বরানগরের মঠ পর্বে ওইরকম দরকার ছিল (অর্থাৎ তপস্যাপূত জীবনের অভ্যাস), এখন এই যুগে মানুষকে ঠাকুরের জীবনের ভাবনা দিতে গেলে এই সন্ন্যাসের ধারাকেও নতুন ভাবস্রোতে প্রবাহিত করতে হবে।''

সন্ন্যাসধারার এই রূপান্তর সাধন যুগপ্রয়োজনে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছিল। স্বামীজী একদিন তুরীয়ানন্দজীকে বলেছিলেন : ''আমি সন্ন্যাসিসঙ্ঘের মধ্যে বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাব।'' একক প্রচেষ্টার মাধ্যমে জগৎকল্যাণ নয়—সঙ্ঘশক্তির সাহায্যে কল্যাণসাধন—এযুগের জন্য অবশ্যপ্রয়োজন। নবীন যুগের আচার্য স্বামীজী সেটিই প্রবর্তন করলেন। স্বামীজীর মতে, সঙ্ঘশক্তির বিকাশ ঘটবে শ্রমবিভাজন (division of labour) ও চারিটি যোগের সুষম সমন্বয়ে। তাঁর দৃষ্টিতে চারটি যোগের সুসমন্বয়ে গঠিত শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনই চূড়ান্ত আদর্শ। স্বামীজী যোগসমন্বয়ে এমনও স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, সঙ্ঘজীবনে কেউ ব্যক্তিগতভাবে চারটি যোগের সুষম সমন্বয় করতে না পারলেও সমষ্টিগতভাবে কারও কারও কোনও যোগের ন্যূনতা অপরের পূর্ণতার দ্বারা পরিপূর্ণ হয়ে সঙ্ঘজীবনে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সকল যোগের সমন্বয় ঘটবে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে দ্বৈত-বিশিষ্টাদ্বৈত-অদ্বৈত সাধনা ও সিদ্ধির মেলবন্ধন ঘটেছিল। স্বামীজীর মতে, প্রত্যেক সাধকের জীবনে উন্নতির পর্যায়ক্রমে দ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত ও অদ্বৈত অনুভূতি এসে উপস্থিত হয়। একটির পর একটি সোপানস্বরূপ। একবার এ-মতটি স্বামীজী একদল পণ্ডিতের সামনে প্রকাশ করলে একজন প্রতিবাদ করে জানালেন : ''এ পথগুলি তো ভিন্ন ভিন্ন পথের অধিকারীর জন্য বিধিবদ্ধ। একই ব্যক্তির জীবনে পর্যায়ক্রমে এ তিনটি অনুভূতি এসে থাকে—এরকম কথা তো পূর্ববর্তী কোনও আচার্য বলেননি?'' সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজী বললেন : ''এটা বলা আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল।''

দ্বৈতস্তর থেকে শুরু করে অদ্বৈতস্তরে পৌঁছানোই হল চূড়ান্ত। স্বামীজী বলেছেন, যেদিন থেকে অদ্বৈততত্ত্ব আবিষ্কার হয়েছে, সেদিন থেকে ধর্মতত্ত্বের চূড়ান্ত আবিষ্কারটি হয়ে গেছে। এখন প্রয়োজন বাস্তব প্রয়োগ। স্বামীজীর মতে, সেই সমাজই সর্বোচ্চ যেখানে উচ্চতম তত্ত্বগুলি বাস্তবায়িত হয়। তত্ত্ব হিসেবে ধর্ম থাকলে স্বামীজী তাতে খুশি নন। তার যথার্থ প্রয়োগেই জগতের কল্যাণ।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনের অন্যতম একটি অভিনব বিশেষত্ব এই, বেদান্তসাধনে সিদ্ধ হয়ে তাঁর মন অন্যান্য ধর্মসম্প্রদায়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হয়েছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনীকার স্বামী সারদানন্দ মত প্রকাশ করেছেন যে, একমাত্র বেদান্তবিজ্ঞানে বিশ্বাসী হয়েই ভারতের হিন্দু ও মুসলমানসমাজ পরস্পর সহানুভূতিসম্পন্ন এবং ভ্রাতৃভাবে আবদ্ধ হতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন : ''হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে যেন একটা পর্বত-ব্যবধান রয়েছে—পরস্পরের চিন্তাপ্রণালী, ধর্মবিশ্বাস ও কার্যকলাপ এতকাল একত্রবাসেও পরস্পরের নিকট সম্পূর্ণ দুর্বোধ্য হয়ে রয়েছে।'' স্বামী সারদানন্দ ইঙ্গিত করেছেন যে, ওই পাহাড় যে একদিন অন্তর্হিত হবে এবং উভয়ে প্রেমে পরস্পরকে আলিঙ্গন করবে, যুগাবতার ঠাকুরের মুসলমান-ধর্মসাধন তারই সূচনা করেছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনসহায়ে যে পুনরায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতিতে ভারতবর্ষ জেগে উঠছে—সে-বার্তাটি নতুন যুগের আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি। নৈনিতালের মহম্মদ সরফরাজ হোসেনকে লিখিত পত্রে (১০.৬.১৮৯৮) স্বামীজী তাঁর মানসচক্ষে দেখা নবীন ভারতের উত্থানের অন্যতম উপায় বর্ণনা করলেন : ''আমাদের দৃঢ় ধারণা যে, বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন, কর্মপরিণত ইসলামধর্মের সহায়তা ব্যতীত তা মানব-সাধারণের অধিকাংশের নিকট সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক। আমরা মানবজাতিকে সেস্থানে নিয়ে যেতে চাই—যেখানে বেদও নেই, বাইবেলও নেই, কোরানও নেই; অথচ বেদ, বাইবেল ও কোরানের সমন্বয় দ্বারাই এটি করতে হবে। মানুষকে শিখতে হবে যে সকল ধর্ম 'একত্বরূপ সেই এক ধর্মে'রই বিবিধ প্রকাশমাত্র, সুতরাং যার যেটি সর্বাপেক্ষা উপযোগী সেটিকেই সে বেছে নিতে পারে।

''আমাদের নিজেদের মাতৃভূমির পক্ষে হিন্দু ও ইসলামধর্মরূপ এই দুই মহান মতের সমন্বয়ই—বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ—একমাত্র আশা।

''আমি মানসচক্ষে দেখছি, এই বিবাদ-বিশৃঙ্খলা ভেদপূর্বক ভবিষ্যৎ পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহা মহিমায় ও অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠছে।''

স্বামী বিবেকানন্দ কোনও বিষয়ে লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য নির্দেশ করেই নিশ্চিন্ত থাকেননি। উপায় নির্দেশেও তাঁর অপরিহার্য ভূমিকা। মিসেস বুলকে লেখা একটি চিঠিতে (২১. ৩.১৮৯৫) সে-উপায় নির্দেশ করলেন : ''আমার গুরুদেব বলতেন, হিন্দু, খ্রিস্টান প্রভৃতি বিভিন্ন নাম মানুষে মানুষে পরস্পর ভ্রাতৃভাবের বিশেষ প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। আগে আমাদের ঐগুলি ভেঙে ফেলবার চেষ্টা করতে হবে। এগুলি পরের মঙ্গল করবার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে, এখন কেবল অশুভ প্রভাব বিস্তার করছে। এগুলির কুৎসিত কুহকে পড়ে আমাদের মধ্যে যাঁরা সেরা, তাঁরাও অসুরবৎ ব্যবহার করে থাকেন। এখন আমাদের ওইগুলি ভাঙবার জন্য কঠোর চেষ্টা করতে হবে এবং আমরা এবিষয়ে নিশ্চয়ই কৃতকার্য হব।''

পূর্ববর্তী আচার্যরা এক-একটি মত বা পথকে অবলম্বন করে তার দার্শনিক ভিত্তি রচনার মাধ্যমে বিভিন্ন মতবাদের প্রবক্তা হয়েছেন। বর্তমান ও ভবিষ্য সভ্যতা যেহেতু সমন্বয়পিপাসু, সেজন্য স্বামীজীর মধ্যে সমন্বয়াচার্যের ভূমিকাটিই বারবার দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি বলেছেন : ''অতীতে যত ধর্মসম্প্রদায় ছিল, আমি সবগুলি সত্য বলে মানি এবং তাদের সকলের সঙ্গে উপাসনায় যোগদান করি। প্রত্যেক সম্প্রদায় যেভাবে ঈশ্বরের আরাধনা করে, আমি তাদের প্রত্যেকের সঙ্গে ঠিক সেইভাবে তাঁর আরাধনা করি। আমি মুসলমানদিগের মসজিদে যাব, খ্রিস্টানদের গির্জায় প্রবেশ করে ক্রুশবিদ্ধ ঈশার সম্মুখে নতজানু হব, বৌদ্ধদের বিহারে প্রবেশ করে বুদ্ধের ও তাঁর ধর্মের শরণ নেব এবং অরণ্যে গমন করে সেইসব হিন্দুর পাশে ধ্যানে মগ্ন হব, যাঁরা সকলে হৃদয়কন্দর-উদ্ভাসনকারী জ্যোতির দর্শনে সচেষ্ট।''

উদারতার প্রতিমূর্তি স্বামীজী বর্তমান মত-পথের স্বীকৃতিদানেই আবদ্ধ থাকলেন না, ভবিষ্যভাবসমূহকে সাদরে আহ্বান করলেন : ''ভবিষ্যতে যেসব ধর্ম আসতে পারে তাদের জন্যও আমার হৃদয় উন্মুক্ত রাখব। ঈশ্বরের বিধিশাস্ত্র কি শেষ হয়ে গেছে, বা তা

চিরকালব্যাপী অভিব্যক্তিরূপে আজও আত্মপ্রকাশ করে চলেছে? বাইবেল, বেদ ও কোরান এবং অন্যান্য ধর্মগ্রন্থসমূহ যে ওই পুস্তকের এক-একটা পৃষ্ঠা এবং তার অসংখ্য পৃষ্ঠা এখনও অপ্রকাশিত রয়েছে—সেসব অভিব্যক্তির জন্য আমি এ-পুস্তক খুলেই রাখব। আমরা বর্তমানে দাঁড়িয়ে ভবিষ্যতের অনন্ত ভাবরাশি গ্রহণের জন্য প্রস্তুত থাকব।"

স্বামী বিবেকানন্দের উদারতা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও যুক্তিনিষ্ঠা এমন আধুনিক পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, তিনি বেদান্তকে ভবিষ্যসভ্যতার ধর্ম বলেই শুধু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেননি, তিনি বিশ্বাস করতেন—ভবিষ্যতে ধর্ম বিজ্ঞানের সঙ্গে করমর্দন করে চলবে। অতীন্দ্রিয় ধর্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে পর্যন্ত বিজ্ঞান ও যুক্তিনিষ্ঠার মানদণ্ডে পরিমাপ করতে স্বামী বিবেকানন্দ ধর্মজগতের ইতিহাসে এক বৈপ্লবিক আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর মতে, যে-ধর্ম বা আধ্যাত্মিকতার তত্ত্ব বিজ্ঞান ও যুক্তির মানদণ্ডে প্রমাণযোগ্য নয়, তা যত তাড়াতাড়ি জগৎ থেকে লুপ্ত হয় ততই মঙ্গল। সে-ধর্ম জগতের কল্যাণ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে।

স্বামীজী ঋষি। তিনি ভবিষ্যদ্দ্রষ্টা। ভবিষ্যকালের জন্য কিছু ভবিষ্যদ্বাণী করা আচার্যের অন্যতম লক্ষণ। স্বামীজী ভারতবর্ষের অতীত মহিমার কথা শতমুখে বলতেন। কিন্তু তিনি মনে করতেন, ভবিষ্যৎ ভারত অতীতের থেকেও বড়ো হবে। তিনি একদিন বেলুড় মঠে বসে বলেছিলেন, ''ভারতবর্ষের আগামী চার-পাঁচশো বছরের ইতিহাসের পাতা উলটে গেল, সব দেখে ফেললাম।" জীবনসায়াহ্নে একদিন বলেছিলেন, ''আগামী পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ভারত স্বাধীন হবে। কিন্তু যেভাবে সাধারণত দেশ স্বাধীন হয়, সেভাবে নয়। কুড়ি বৎসরের মধ্যেই একটা মহাযুদ্ধ হবে। পাশ্চাত্য দেশগুলি যদি materialism না ছাড়ে, তাহলে আবার যুদ্ধ অনিবার্য। স্বাধীন ভারতবর্ষ ক্রমে পাশ্চাত্যের materialism নেবে। প্রাচীন ঐহিক গৌরবকে নতুন ভারত ম্লান করে দেবে। আমেরিকা প্রভৃতি দেশ উত্তরোত্তর অধ্যাত্মবাদী হবে। তারা জড়বাদের শিখরে পৌঁছে বুঝবে—জড়ে শান্তি দিতে পারে না।" স্বামীজী আরও বলেছেন, ''ইংরেজরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যাওয়ার পর চীনের দ্বারা ভারত অধিকৃত হওয়ার বিরাট আশঙ্কা আছে।" ১৮৯৭ সালে এক বক্তৃতায় স্বামীজী আহ্বান করেছিলেন : ''আগামী পঞ্চাশ বছর দেশমাতৃকা কেবল তোমাদের আরাধ্যা হোন।" ১৯৪৭ সালে ঠিক পঞ্চাশ বছর পর ভারত স্বাধীন হল। ক্রিস্টিন বলেছেন—শূদ্রজাগরণ প্রসঙ্গে স্বামীজী একদিন বলেছিলেন, হয় রাশিয়া না হয় চিনেই তা ঘটবে। স্বামীজী বলেছেন, ''একদিন বেলুড় মঠ বিশ্ববিদ্যালয়ের আকার নেবে।" স্বামীজীর ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি।

অবতারপুরুষ নিজে তাঁর Prophet-কে চালিত করছেন—এটা পূর্ব যুগে দেখা যায়নি। স্বামীজী পদে পদে উপলব্ধি করেছিলেন, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁর মধ্য দিয়ে কাজ করছেন। গুরুভাইদের উদ্দেশে (১৮৯৪) স্বামীজী লিখছেন : ''তিনি পিছে আছেন। আমি আর লিখতে পারছি না, Onward—এই কথাটা খালি বলছি। যে যে এই চিঠি পড়বে, তাদের ভিতর আমার Spirit (শক্তি) আসবে, বিশ্বাস কর।... আমার হাত ধরে কে লেখাচ্ছে।... আমি আর লিখতে পারছি না, বাকি তিনি নিজে বলুন গে।"

জি জি নরসিংহাচারিয়ার-কে উপলক্ষ্য করে অনাগতকালের অনুরাগীদের উদ্দেশে স্বামীজী তাঁর ভিতরের আগুন যেন ছড়িয়ে দিলেন আশীর্বাদরূপে : ''কাজে লাগো... দূর করে দাও যত আলস্য, দূর করে দাও ইহলোক ও পরলোক ভোগের বাসনা। আগুনে গিয়ে ঝাঁপ দাও এবং লোককে ভগবানের দিকে নিয়ে এসো।... আমার ভেতরে যে আগুন জ্বলছে, তা তোমাদের ভেতর জ্বলে উঠুক; তোমাদের মন-মুখ এক হোক—ভাবের ঘরে চুরি যেন একদম না থাকে। তোমরা যেন জগতের যুদ্ধক্ষেত্রে বীরের মত মরতে পারো—এই সর্বদা বিবেকানন্দের প্রার্থনা।" এই আশীর্বাদ ও প্রার্থনাই নতুন যুগের নতুন আচার্য স্বামী বিবেকানন্দের নতুন বার্তার নিষ্কর্ষ।